EPISODE : 6- The Science /Phenomena of Global Warming

যদি পৃথিবী টা গরমের দেশ হয়

সাইন্স কম্যুনিকেটরস ফোরামের পক্ষে ড.অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র বিশ্লেষণ

রোদ্দুর- (বয়স ১৯বছর**)**বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র ।

ঝর্ণা- (বয়স ৪৮বছর**)**রোদ্দুরের মা ।

বৃষ্টি-(বয়স ১৯বছর**)**রোদ্দুরের বন্ধু । বি এস সি ভূগোল অনার্স এর প্রথম বর্ষের ছাত্রী ।

সূর্য - (বয়স ৫২বছর**)** রোদ্দুরের বাবা ও ঝর্ণার স্বামী ।স্থানীয় স্কুলের ভূগোলের মাস্টারমশাই।

আকাশ -(বয়স ২৭বছর**)** সূর্যর ছাত্রা। সূর্যর বড় ছেলে **মেঘ , এর** বন্ধু।পারিবেশ নিয়ে এখন পি এইচ ডি করছে।

ভোলা-**(**বয়স ৪০বছর **)**সূর্যর বাবার আমল থেকে আছে, বাড়ির কাজের লোক ।

বেতার ঘোষক - পুরুস কন্ঠ

(প্রথমদৃশ্য)

রৌদ্দুর – ওমা , মা , একটু রেডিও টা চালাও তো।

৮ টা বাজতে চলল । জানা অজানা টা শুনে নি।

ঝর্ণা--আজ কার রেডিও টক আছে,**রৌদ্দুর ?**

(রেডিও অন করার শব্দ, হালকা ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত-তুমি রবে নীরবে..)

রৌদ্দুর – আকাশ **দে -র।**আকাশদার একটা রেডিও টক আছে।

ঝর্ণা - কোন আকাশ?

রৌদ্দুর –বাবার ছাত্র।

ঝর্ণা - ও বুঝেছি।

সূর্য- -আজ আকাশ-**র** রেডিও টক**?** শুনতেই হবে।

বেতার ঘোষক - রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলেন- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। এখন সকাল ৮ টা। জানা অজানা। (হালকা ভাবে মিউজিক...)

আজ জানা অজানায় শুনবেন বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন।বলছেন আকাশ **দে ।**

পোল্যান্ডের কাটওয়াইশ শহরে শেষ হল ২৪ তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন।২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য ছিল বিভিন্ন দেশের গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ প্রশমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ। সঙ্গে ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার নিরসন এ উন্নত দেশগুলোর বার্ষিক ১০০০ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি। প্যারিস চুক্তি রূপায়ণের নিয়মাবলী প্রণয়ন ও আর্থিক সংস্থান এর বিষয়টি পাকা করাই ছিল এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।

ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আইপিসিসির বিশেষ প্রতিবেদন।আইপিসিসির বিজ্ঞানীদের মতে আগামী দিনে বিশ্বের তাপমাত্রা -বৃদ্ধি প্রাক শিল্পায়ন যুগের তুলনায় ২ ডিগ্রির পরিবর্তে ১.৫ ডিগ্রি তে সীমা সীমিত রাখা না হলে আরো ঘোর বিপদে পড়বে মানুষ। বিজ্ঞানীদের মতে তাপমাত্রা -বৃদ্ধি ১.৫ডিগ্রি তে সীমিত রাখতে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন-ডাই-

অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে হবে এবং ২০৫০ সালে তা শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। এর অর্থ বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে ও প্রযুক্তির সাহায্যে ২০৫০সালে পৃথিবীতে গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন ও অপসারণের সমতা আনতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যা আকাশকুসুম।

রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ কর্মসূচির ২০১৮-এর সমীক্ষা জানায়, গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন বিগত বছরগুলোর তুলনায় ঊর্ধ্বমুখী। গত বছরে ক্রমন্নত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতেই সিংহভাগ গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদন হয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে। ১৯৯৭ সালের কিয়োটো চুক্তি অনুসারে এই দেশ গুলির বর্ধিত দায়িত্ব আছে ২০২০ সালের মধ্যে এই ক্ষতিপূরণের। কথা ছিল, সুনির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন কমিয়ে আনবে তারা। বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে কিয়োটো চুক্তি ও মানেনি আমেরিকা। অন্য অনেক শিল্পোন্নত দেশও সফল হয়নি উৎপাদন হ্রাসের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে। অর্থনীতিক বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিগত বছরের তুলনায় ও চীন ও ভারতের নিঃস্বরনও বেড়েছে উদ্বেগজনক।

কাটওয়াইশ শহরে সম্মেলনে প্রবল বিতর্ক হয়েছে আইপিসিসির বিশেষ প্রতিবেদন কে কেন্দ্র করে। তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রিতে সীমিত রাখার সুপারিশ এর তীব্র বিরোধিতা করেছে আমেরিকা, রাশিয়া এবং সৌদি আরব কুয়েত এর মত তৈল ভান্ডার সমৃদ্ধ দেশ। জীবাশ্ম জ্বালানি- নির্ভর বিকাশের পথ থেকে সরে না আসার যুক্তি দিতে তারা নস্যাৎ করতে চেয়েছে প্রতিবেদন এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটাকেই। তুমুল প্রতিক্রিয়া হয়েছে উপস্থিত বিজ্ঞানী ও পরিবেশ কর্মীদের মধ্যে। চিরাচরিত তর্ক হয়েছে গ্রীন হাউজ গ্যাস প্রশমনে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সমতা ও পৃথক দায়িত্বের বিষয় নিয়ে।গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদনে উন্নত দেশগুলির বর্ধিত দায়িত্বের প্রশ্ন অনেকটা পিছনে চলে গিয়েছে ।

ঘটনা হলো ,ঐতিহাসিক ভাবে কার্বন পরিসরের ৭৫% আছে পশ্চিমের দেশ গুলির অধিকারে। উন্নয়নের চলতি ধারা ও গ্যাস উৎপাদনের প্রবণতা বজায় থাকলে বৈষম্য আরো বাড়বে। তীব্র সঙ্কটে পড়বে উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জ্বালানি সুরক্ষা, জীবন-মান। আন্তর্জাতিক মঞ্চের দাবি - এই দেশ গুলিকে আর্থিক ও প্রযুক্তিতে সহায়তা দিতে হবে যাতে তারা গ্যাস প্রশমনে কার্যকর ব্যবস্থা করতে পারে। ভারত ও অন্য কিছু দেশের বক্তব্য, গত তিন বছরে উন্নত দেশগুলি থেকে প্যারিস চুক্তির প্রতিশ্রুতি মতো আর্থিক সহায়তা মেলেনি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহমত ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি না হলে উষ্ণায়নের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি তে সীমিত রাখতে হলে বিশ্বের মোট আয়ের এর ২.৫% বিনিয়োগ জরুরি। ২০১৭ সালে বিশ্বে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২.২ শতাংশ। প্রশ্নটা অগ্রাধিকারের। নিম্নআয়ের মানুষের জ্বালানি সুরক্ষা এবং উষ্ণায়নের দ্বন্দ্বের নিরসন না হলে সামাজিক অসন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। অনেকগুলি উদাহরণ রয়েছে আমাদের সামনে ।কিন্তু উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রনায়করা কি

একমত হবেন? লক্ষ্যণীয় ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এ ৮0 লক্ষ মানুষ উষ্ণায়নের ফলে চরম বিপদের সম্মুখীন হলেও আন্তর্জাতিক স্তরে এখনো কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা হয়নি।

বিপদের মোকাবিলা ভারতের ভূমিকা কি?, উল্লেখ সর্বাধিক কার্বন উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ভারত তৃতীয়, অথচ মাথাপিছু উৎপাদন এ সে সবার শেষে। আমাদের সমস্যা দ্বিমুখী। তৃতীয় বৃহৎ অংশীদার হওয়ায় সামগ্রিকভাবে গ্যাস নিঃসরণ কমানোর দায় আছে। অন্যদিকে দেশে মাথাপিছু জ্বালানি ও বিদ্যুৎ এর ব্যবহার সর্বনিম্ন। উন্নত বিশ্বের সব দেশ তো বটেই এমনকি ব্রাজিল ,ইন্দোনেশিয়ারও পিছনে। হিসেব মতো ২০৩০ এর পরে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা এবং গ্যাসের উৎপাদন সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছবে ।এখনই উষ্ণতাজনিত ক্ষতির পরিমাণ জিডিপির ১.৫ শতাংশ। কৃষি ক্ষেত্রে প্রতি বছর গড়ে ৭ শতাংশ হারে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং তাপপ্রবাহের কারণে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকে। তাপমাত্রা আরো বাড়লে বাসযোগ্যতা হারাতে পারে বলে দেশের অনেক উপকূল, পাহাড়ি ও কৃষি অঞ্চল। পূর্বাভাস আছে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাস্তুচ্যুত হতে পারেন সুন্দরবনের বিপদসংকুল অঞ্চলের প্রায় ৩ লক্ষ পরিবার।

২০০৮ সালে ঘোষণা হয়েছিল জাতীয় পরিকল্পনা নেশনাল একশন প্লান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। এর পর বিভিন্ন রাজ্য তৈরি করেছে তাদের পরিকল্পনা।থামতি রয়েছে বিস্তর। পরিকল্পনার কার্যকারিতা যাচাইএ নেই কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড। জাতীয় পরিকল্পনার আটটি মিশনের প্রস্তাব ছিল। এর মধ্যে দুটি –নাশনাল মিশন ফর সাসটিনেবেল হিমালইয়ান ইকোসিস্টেম, ও নেশনাল মিশন অন সাসটিনেবেল হাতিয়ার। জীববৈচিত্র্য ও উন্নায়নের কেন্দ্রবিন্দু হিমালয় পর্বত অঞ্চল নিয়ে অনেকগুলি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প সরকার অনুমোদন করে সাসটিনেবেল হিমালইয়ান ইকোসিস্টেম মিশনে। অনেকগুলি গবেষণাপত্র প্রকাশ ্পেলেও সুপারিশ গুলি সরকারী নীতি পরিবর্তনে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।

দ্বিতীয় মিশনটিও গুরুত্বপূর্ণ। ৭০% কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন হয় শহরগুলিতে। পরিবহন, বাড়ি নির্মাণ, বিদ্যুৎ পরিষেবা ইত্যাদির জন্য। উত্তরাখণ্ড ও কেরল সাম্প্রতিক বিপরযয়ের পরে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করেছে। ভারতের মতো দেশে উষ্ণায়ন মোকাবিলায় বহুমাত্রিক ও সমন্বিত পরিকল্পনা আবশ্যাক।

বর্তমান দেশে কৃষি ঋণ মুকুব করা নিয়ে বোধহয় কিছুটা সহমত তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে কৃষকরা যে বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছহেন,তাতে ঋণ মুকুব হয়তো জরুরি। কিন্তু কৃষি সমস্যার অন্যতম উৎস জলবায়ুর খামখেয়ালিপনা ও পরিবর্তন। জাতীয় ও বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনায় এখনো প্রধান গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সেচের এর উপর। বাড়তি নজর দেয়া প্রয়োজন শস্য বিচিত্র, বৃষ্টি নির্ভর কৃষি ও সুসংহত জলবিভাজিকা প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে। এতে জলের সাশ্রয় হবে। তৈরি হবে স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে সুস্থায়ী উন্নয়নের নকশা, যা হতে পারে উষ্ণায়নের বিপদ মোকাবিলা হাতিয়ার।

বেতার ঘোষক – আজ জানা অজানায় শুনলেন বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন।বললেন আকাশ **দে।**

এখন লোক গান। শিল্পি আব্বাসুদ্দিন-আল্লা মেঘ দে পানি দে.....

ঝর্ণা -দারুন বলল আকাশ। তাই না?

রোদ্দুর-ওই এক রকম বলল, আর কি।

সূর্য- হ্যাঁরে রোদ্দুর , নিজে তো বলতে পারিস না। কেউ বল্লে একটু ভাল করতে পারিস না
ঝর্ণা- যা বলেছ, ছেলেটা একদম...।
ভোলা- অ, রোদ্দুর দাদাবাবু ! বাবু -মা ঠিক কইছিলেন ! আকাশ দারুন বলেছে।
রোদ্দুর-এই ভোলা দা , তুমি এত কথা বলছ, কিছু বুঝেছ?
ভোলা-না, দাদাবাবু ।বুঝি নাই। তবে দারুন বলেছে আমাদের **বাবুর ছাত্র টি।**

(কলিং বেলের শব্দ)

সূর্য-দেখতো **ভোলা** , কে এলো ?

ভোলা–যাই বাবু।

সূর্য- আয়রে ভোলা , খেয়াল খোলা, পাগলা হাওয়ায় মাতিয়ে আয় .....।(মিউজিক)
ভোলা– (দরজা খোলার শব্দ) ও, তুমি, এস এস ।
ঝর্ণা -কে এলোরে **ভোলা**?

ভোলা-মা, বৃষ্টি দিদিমণি এসেছে।

সূর্য- আয় বৃষ্টি ঝেপে ধান দেব মেপে .....।(মিউজিক)

বৃষ্টি-কি ব্যাপার, মেসমাসাই? আজ খুশি খুশি দেখাচ্ছে?
সূর্য- আমার ছাত্র আজ রেডিও টক দিয়েছে। রেডিও টক টা শুনে মনটা ভাল হয়ে গেছে।
বৃষ্টি-আপনার ছাত্র?
সূর্য- হ্যাঁ, **আমার ছাত্র আকাশ্,**
বৃষ্টি-ও, **আকাশ্ দা?**
সূর্য- হ্যাঁ, ও তো পারিবেশ নিয়ে এখন পি এইচ ডি করছে।

বৃষ্টি- বাহ, দারুন ব্যাপার।

সূর্য- বৃষ্টি, তোমার সাঙ্গে কিছু আলোচনা আছে।

বৃষ্টি- হ্যাঁ , মেসোমশাই।

ঋর্ণা – আরে , ওকে ছাড় একটু। এতো দূর থেকে এসেছে। হাত পা ধুক , জলখাবার খাক, তারপর **তোমার** সাথে কথা বলবে।

সূর্য-- হ্যাঁ , যাও মা , যাও। ভিতরে যাও।আমি একটু বাজার থেকে গুরে আসি।

(মিউজিক)

দ্বিতীয়দৃশ্য।

সূর্য - (একটু জোরে) ভোলা, এই ভোলা,তুই তাড়াতাড়ি আয় ,বাজার একেবারে আগুন!কি গরম বাইরে!সকাল ৯ টাতেই আবহাওয়া গরম ..... গরমপৃথিবী গরম করলে তুমি।
ঋর্ণা – এই ভোলা,ভোলা, বাজার টা ধর...বাবুর থেকে নে।
রোদ্দুর – (রেগে গিয়ে)-দাও আমাকে দাও।**ও কে এখন পাবে না।**
সূর্য -আয়রে ভোলা , খেয়াল খোলা, পাগলা হাওয়ায় মাতিয়ে আয় .....।(মিউজিক)
(ভোলার প্রবেশ)
ভোলা- (হন্ত দন্ত হয়ে) ও ..... , রোদ্দুর দাদাবাবু ! বাবু কি কইছিলেন ! আবহাওয়া গরম, পৃথিবী গরম। পৃথিবী আবার গরম হবে কি করে ?

রোদ্দুর – (রেগে গিয়ে) জানিনা, তোমার তোমার বাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

বৃষ্টি-ভোলা দা ,আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি । তুমি আগে চটপট চা করে নিয়ে এসো তো।
ভোলা – (আগ্রহ দেখিয়ে)কিন্তু পৃথিবী আবার গরম হবে , ব্যাপারটা.....

বৃষ্টি – (একটু হেসে) ভোলা দা দেখছি ছাড়বে না, তাহলে শোনো -
ভোলা – হ্যাঁ , বলো বৃষ্টি দিদিমণি।
বৃষ্টি-ভোলা দা , আসলে মনুষ্য সমাজের কৃতকর্মের ফলে পৃথিবীর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড এর মত গ্রীনহাউজ গ্যাসগুলো। এই গ্যাস পৃথিবী কে উত্তপ্ত করে তুলছে।
ভোলা – কিন্তু কিভাবে?
বৃষ্টি-আসলে কার্বনঅক্সাইড সহজেই বাতাসে বিয়োজিত হয় না-ডাই-। হতে সময় লাগে প্রায় ১৫০০ বছর। এই গ্যাস বড় মাপের তাপ তরঙ্গ শোষণের ক্ষমতা রাখে। ঠিক যে ব্যাপারটা আমরা কাচের ক্ষেত্রে ঘটতে দেখি। চিন্তা করো বোটানিকাল গার্ডেনের গ্রীন হাউস এর কাচের তৈরি দেওয়ালের কথা। যার মধ্যে দিয়ে সূর্যের ছোট মাপের তাপ তরঙ্গ ঢুকে পড়ে। ভিতরে মাটি

কে তাতিয়ে দেয়। মাটি থেকে যে বড় মাপের তাপ তরঙ্গ নিঃসৃত হয়, তা কিন্তু আর কাচের দেয়াল এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে বাইরে ঠান্ডা হলেও গ্রীন হাউস এর ভেতরটা গরম থাকে। এই ব্যাপারটা হল গ্রীন হাউস এফেক্ট। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। সূর্যের আলো বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড এর স্তর পেরিয়ে বিনা বাধায় চলে আসে । কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকে প্রতিফলিত তাপকে কার্বন ডাই অক্সাইড এর স্তর শোষণ করে নেয় । তারই ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া মন্ডল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে।

ভোলা – আচ্ছা, বৃষ্টি দিদিমণি , আমি বরং চা টা করে নিয়ে আসি ; না হলে আবার এই বাড়ির আবহাওয়া গরম হয়ে যেতে পারে ।

তৃতীয় দৃশ্য

(মোবাইলের রিংটোন)

সূর্য - -হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো , হ্যালো,..... কে আকাশ ?কেমন আছিস বাবা ! সব ঠিকঠাক তো । একটু জোরে বল । শুনতে পাচ্ছি না । হ্যাঁ বল এবার.....

আচ্ছা.....

আচ্ছা.....

আচ্ছা.....

হ্যাঁ বল

আচ্ছা.....

আচ্ছা.....

শুনতে পাচ্ছি না

একটু জোরে বল

হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি

বল এবার

আচ্ছা.....

আচ্ছা.....

হ্যালো, হ্যালো.....

যা ! ফোনটা কেটে গেল

ঝর্ণা -কে ফোন করেছে?

সূর্য - -আকাশ্-

ঝর্ণা -কি বলল?

সূর্য -আজ আসবে

ঝর্ণা -কখন?

সূর্য -এখুনি

(কলিং বেলের শব্দ)

ঝর্ণা –দেখতো **ভোলা** , কে এলো ?

ভোলা–যাই মা।

সূর্য - -আকাশ্ হবে বোধ হয়
ভোলা– (দরজা খোলার শব্দ) ও, তুমি, এস এস ।
সূর্য -কে?
ভোলা–টক বাবু এসেছে।
ঝর্ণা –টক বাবু !
ভোলা– **আরে আজ** রেডিও টক দিয়েছে না।

-আকাশ্ -আমি -আকাশ্ মাস্টার মশাই।

সূর্য - -আরে আকাশ্ এসো এসো।

-আকাশ্ -ভাল আছেন মাসিমা?

ঝর্ণা -আরে থাক থাক । এত পায়ে হাত দিয়ে প্রানাম করতে হাবে না।-**আজ** তোমার রেডিও টক টা শুনলাম।

-আকাশ্ - শুনেছেন! কেমন লাগলো?

ঝর্ণা - খুব **ভাল। বড়ো হও।**

-আকাশ্ -আমার আনুপ্রেরানা তো মাস্টারমশাই , **সূর্য বাবু তো সকলের প্রিয় স্যার।**

ঝর্ণা - তোমরা কথা বলো। আমি একটু ভিতরে যাচ্ছি।

রোদ্দুর –আকাশ্ দা , কখন এলে?-

আকাশ্ -এই তো

বৃষ্টি–রেডিও টক দারুন হয়েছে।

আকাশ্ - আরে বাবা, রোদ্দুর -বৃষ্টি এক সঙ্গে?

ভোলা– **আকাশ্ এ আজ শুধু মেঘ নেই। বাকি সব আছে গো।** (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

ঝর্ণা –এই **ভোলা** , **ভোলা**?
ভোলা–যাই মা।

আকাশ্ -দেখতে দেখতে কতো দিন হয়ে গেল। মেঘ আমাদের মাঝে নেই।

সূর্য- ছেলে টা কুলু বেড়াতে গিয়ে , মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টিতে মারা গেলো।

আকাশ্ - বিশ্ব উষ্ণায়নের ফল।

রোদ্দুর – গ্লোবাল ওয়ারমিং!

আকাশ্ - বর্তমানে আমাদের পৃথিবী গ্রীন হাউজে পরিণত হতে চলেছে। খুব ধীরে ধীরে আমাদের চারপাশে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যার ফলে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মত রয়েছে কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারটা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন।

রোদ্দুর – কেন এমনটা হচ্ছে ? কি ঘটবে **আকাশ্দা**?

আকাশ্ - পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ বরফ গলেযাবে যাবে । উষ্ণতা বৃদ্ধির বর্তমান হার বজায় থাকলে প্রতি দশকে সমুদ্রতলের উষ্চতা বাড়বে ছয় সেন্টিমিটার করে। ২০৩০ সালে সমুদ্রতলের উষ্চতা বাড়বে প্রায় কুড়ি সেন্টিমিটার । ২০৫০ সালের ৩০ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার , আর ২১০০ সালে প্রায় ৬৫ সেন্টিমিটার। ডুবে যাবে পৃথিবীর সমস্ত নিচু দ্বীপপুঞ্জ । মালদ্বীপ ইত্যাদি দেশ চলে যাবে জলের তলায় ।মুম্বাই চেন্নাই কলম্বো টোকিও শহর সহ পৃথিবীর ৬০**%** মানুষ তাদের অবস্থান হারাবে । সমুদ্রগর্ভে ডুবে যাওয়া এলাকা থেকে মিথেন গ্যাসের উৎপাদন বাড়বে । ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা আরো বাড়বে ।নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আমাদের সুন্দরবন। সুন্দরবনের লোহাচড়া দ্বীপ সমুদ্রে তলিয়ে গেছে ।আইপিসিসি ভবিষ্যৎবাণী করেছে ২০০০ সালের মধ্যে সুন্দরবনের সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে ।উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড । এখানে প্রতি দশকে উষ্ণতা বাড়ছে ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সূর্য- বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জীববৈচিত্র্য ।পৃথিবীতে হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিভিন্ন উষ্ণতা যুক্ত অঞ্চলে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে আছে । উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটলে ঐ সমস্ত জীবের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যাবে ।বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী মিলিয়ে অন্তত ৪০ টি প্রজাতি পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে ।পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে আমাদের চেনাজানা পাখিদের ৭০**%** আজ বিপন্ন । স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতিদের মধ্যেও ২৪ শতাংশ প্রজাতি আজ অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে। সমুদ্রের জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ৩০**%** মাছের প্রজাতি আজ বিলুপ্তির প্রহর গুনছে । শুধু ভারতেই কমবেশি ১৫ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিপন্ন হয়ে পড়েছে ।

বৃষ্টি–আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়েও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি ।১৫ থেকে ২০ বছর আগেও আলিপুর চিড়িয়াখানা ও সাঁতরাগাছি ঝিলের শীতকালে যত পরিযায়ী পাখি আসতো, আজ তা আসছে না।

রোদ্দুর – পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফল?

আকাশ্ - রোদ্দুর , আমাদের প্রায় সকলের জানা যে জলবায়ু বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের ৩০থেকে ৩৫ বছরের গড় আবহাওয়া কে বোঝায়। জলবায়ু বলতে শুধু কোন অঞ্চলের উষ্ণতা বা তাপমাত্রা কে বোঝায় না। উষ্ণতা ছাড়াও বৃষ্টিপাত, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বা আদ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি জলবায়ুর অন্তর্গত। এগুলোর যে কোনটির পরিবর্তন ঘটলেই তা জলবায়ুকে প্রভাবিত করতে পারে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কেন

উষ্ণতা বাড়ার প্রতি বেশি নজর দেয়া হচ্ছে? সম্ভাব্য উত্তরটি হচ্ছে যে প্রথমত জলবায়ুর নানান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উষ্ণতা পরিমাপের তথ্য বেশ সুলব। আর উষ্ণতা সরাসরি গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয়ত, উষ্ণতা মাপার বেলায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে তাকে মাপতে হয়। মানুষের কাজের প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই সময় কাল টিকে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময় থেকে ধরা হয়। সাধারণত ভূপৃষ্ঠের বার্ষিক গড় উষ্ণতার পরিবর্তন কেই আমরা হিসেবের মধ্যে ধরি। কেননা ভূপৃষ্ঠের ওপরের উষ্ণতার বাড়া কমার যেকোনো প্রবনতার তথ্যই বেশ বিশ্বাসযোগ্য, কারণ এতে কোন ছোট অঞ্চলের উষ্ণতার ফারাক ও গড় হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠ যে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে এটা মাপতে গেলে অনেকদিন সময় লাগে। সাধারণ থার্মোমিটার দিয়েই এই তথ্য নেয়া হয়। পৃথিবীর নানা জায়গায় প্রতিদিনের উষ্ণতার তথ্য রাখা হয়। পরে সামগ্রিকভাবে এই তথ্যগুলো গর থেকে পৃথিবী জুড়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা পাওয়া যায়। স্থলভাগের নানান জায়গায় এবং জলভাগের সমুদ্রের উপর জাহাজে বিগত প্রায় ১৫০বছর ধরে এরকম ভাবে উষ্ণতা মাপা চলছে। এসব তথ্য মানুষের হাতে আছে। এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীজুড়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা বেড়েছে ০.৪ ডিক্রী থেকে ০.৮ ডিক্রী সেন্টিগ্রেড । দুটি স্পষ্ট পর্যায়ে এই উষ্ণটা বেড়েছে। প্রথমটি ১৯১০-১৯৪০ এর মধ্যে এবং দ্বিতীয় টি ১৯৭৬ সাল থেকে বর্তমান কাল অবধি। বিগত ১৫০ বছরের উষ্ণটার তথ্য থেকে এও দেখা যাচ্ছে যে শহর অঞ্চল গুলো পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা গ্রামের তুলনায় বেশি উষ্ন।কঙ্কিতের তৈরি বাড়ি ও পাকা রাস্তা গাছ পালার চেয়ে বেশি সূর্যের আলো শোষণ করে বলে বেশি উষ্ণা হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে আরবান হিট আইল্যান্ড এফেক্ট বলা হয়।ভূ পৃষ্ঠের গড় উষ্চতা মাপতে পৃথিবীজুড়ে বিস্তীর্ণ ভাবে নানা পরিমাপ কেন্দ্রে তাপমান যন্ত্র রাখা হয়েছে এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বা সম্পূর্ন নয়। সেই জায়গাগুলোতে তাপমান যন্ত্র রাখা সম্ভব হয়েছে যেখানে মানুষ যেতে পেরেছে। সমুদ্রের উপরে উষ্চতা পরিমাপ কারি জাহাজগুলি দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় স্থির থাকে নি। ফলে পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতার তথ্য একেবারেই ঠিক নয়। এই অসুবিধা এড়াতে বিজ্ঞানীরা এখন উপগ্রহের মাধ্যমে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্চতা পরিমাপ করছেন। এতে অনেক বেশি জায়গাজুড়ে পৃষ্ঠের উষ্ণতার প্রায় নির্ভুল তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

ঝর্ণা- আবার পরে তথ্য পাওয়া যাবে । এখন সব জলখাবার খাবে চলো।
সূর্য-হ্যাঁ , চলো। **আকাশ্ এসো ।বৃষ্টি, রোদ্দুর সবাই এসো।খুব খিদে পেয়ে গেছে।**

এই ভোলা, সব রেডি তো?

ভোলা– হ্যাঁ, বাবু আসুন সাবাই।
সূর্য–আয়রে ভোলা , খেয়াল খোলা, পাগলা হাওয়ায় মাতিয়ে আয় .....।(মিউজিক)

শেষ দৃশ্য
(...টিভি তে সত্যজিত রায় এর আগন্তুক সিনেমা চলছে- উৎপল দত্ত -সভ্য কারা জানেন.....)
আকাশ্ - এটা এক্ টা সাধারন সিনেমা
সূর্য– হ্যাঁ আমরা সভ্যতার নামে আরো সভ্য হয়ে উঠছি।
রোদ্দুর - আচ্ছা, জলবায়ু পরিবর্তনে কেন শুধু উষ্ণতা নিয়ে আলোচনা হয়? উষ্ণতা ছাড়া পৃথিবীর উষ্ণায়ন বোঝার আর কি উপায় নেই?
সূর্য–ভালো প্রশ্ন । পৃথিবীর উষ্ণায়ন বোঝার আর কি কি উপায় আছে?
আকাশ্ - বৃষ্টি, মনে হচ্ছে কিছু বলবে।

বৃষ্টি- হ্যাঁ , উষ্ণতা ছাড়া পৃথিবীর উষ্ণায়ন বোঝার উপায় আছে
যেমন-হিমবাহের তথ্য, **সমুদ্র তল,**সমুদ্রের বরফ ইত্যাদি।
সূর্য–ব্যাখা দাও।

বৃষ্টি–পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ১০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে হিমবাহ। এর বেশির ভাগটাই রয়েছে কুমেরু অঞ্চলে এবং গ্রিনল্যান্ডে। উষ্ণ জলবায়ুতে হিমবাহ গলে যায়। ফলে আকারেও ছোট হয়ে পিছিয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর ধরেই মানুষ নানান হিমবাহের আকারে দৈর্ঘ্য মেপে রেখেছে। ফলে হিমবাহ গলে গিয়ে আকারে ছোট হলে সহজেই তা ধরা যায়। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০সাল আবধি ৩৬ টি হিমবাহকে আলাদা ভাবে মাপা হয়েছিল। দেখা গেল যে এর ৩৫টি আকারে ছোট হয়ে পিছিয়ে গেছে।একটি আকারে বড় হয়ে এগিয়েছে। ১৯০০সাল থেকে ১৮০ সাল আবধি ১৪৪ টি হিমবাহের তথ্য নেয়া হয়েছিল। তথ্যে দেখা গেল যে মাত্র দুটি এগিয়েছে বাকি ১৪২ টি পিছিয়ে গেছে।২০০৫ সালের এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে ১৭০০ সাল থেকে মাপা পৃথিবীর নানান হিমবাহের দৈর্ঘ্য গড় বদল ঘটেছে তা শুরু ১৮০০ সাল থেকে। এ সময় থেকে হিমবাহের গড় দৈর্ঘ্য কমতে শুরু করে। ১৯ শতকের প্রথম ভাগ জুড়ে হিমবাহের আকার দ্রুত কমে আসতে থাকে। আর এটা ঘটেছে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে। এভাবে হিমবাহের আকার ছোট হয়ে পিছিয়ে যাবার অন্যতম অন্যতম প্রধান কারণ বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব।

সূর্য– আবার প্রধানত তিনটি কারণে উষ্ণ জলবায়ুতে সমুদ্রতল উঁচু হয়ে ওঠে। প্রথমত, আর সব পদার্থের মতো জল গরম হলে আয়তনে বাড়ে। ফলে উষ্ণ জলবায়ুতে জলের আয়তন বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত উষ্ণতার প্রভাবে হিমবাহ বা ভূমি ভাগের ওপরে অন্যান্য বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রে মেশে। এতে সমুদ্রের জলতল বারে।হিমজুগে ঠিক এর উল্টোটা ঘটে।বিগত হিমজুগে বিপুল জলরাশি বরফের আকারে জমেছিল মহাদেশীয় হিমবাহ হয়ে।এর ফলে বর্তমানের চেয়ে সমুদ্রতল নিচু হয়ে গিয়েছিল প্রায় একশো কুড়ি মিটার। তৃতীয়তঃ স্থলভাগ এ রদেও ভৌম জল স্তরে যে বিপুল জলরাশি জমা থাকে তারা সমুদ্রতলের পরিবর্তন সাধন করতে পারে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে কৃষিতে সেচের কাজে বা অন্য উদ্দেশ্যে ভৌম জল স্তর থেকে পাম্প করে জল তুলে ব্যবহার করলে তা শেষে গিয়ে সমুদ্রে এই মেশে নানা নদীর মাধ্যমে। এতেও জলতল বেড়ে যেতে পারে।

নানান জায়গায় জোয়ারের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীজুড়ে সমুদ্রতলের উষ্ণতা বেড়েছে প্রতি বছরে প্রায় ১৫ মিলিমিটার বা গোটা শতাব্দীতে ১৫ সেন্টিমিটার। এই তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে উনিশ শতকের তুলনায় বিশ শতকে সমুদ্রতল উচু হয়ে যাওয়ার হার বেশি। সমুদ্রতল এভাবে উঁচু হওয়ার বেশ ক'টি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। তবে সমুদ্র বিজ্ঞানীরা বলছেন তাপমান যন্ত্রে মাপা সমুদ্রের জল পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ার তথ্য গুলিকে বিশ্লেষণ করে মোটামুটি নিশ্চিত যে পৃথিবী জুড়ে উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রতলের উষ্ণতা বেড়েছে।

বৃষ্টি– আর মেরু অঞ্চলে অতিরিক্ত ঠান্ডায় সমুদ্র জল জমে বরফ হয়ে যায়। সমুদ্রের উপরে কয়েক মিটার পুরু এরকম বরফের স্তর দেখা যায়। যেখানে উষ্ণতা অত্যন্ত কম, মেরু অঞ্চলে সেখানেই সমুদ্রের উপর এরকম বরফ জমতে দেখা যায়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস মেশায় জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেরু অঞ্চলে সমুদ্রের এই বরফের স্তর এর দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যেতে পারে।
সুমেরুর সাগরে ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি বরফ স্তরের যে গড় আয়তন ছিল ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে তা প্রায় ১০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার আয়তন কমে গেছে। সুমেরু সাগরে প্রতি প্রতি দশকে প্রায় ২.৪ শতাংশ হারে বরফের গড় আয়তনটি কমেছে। পৃথিবীর উষ্ণ অক্ষাংশে এই সময় কালে উষ্ণতা ক্রমশ বেড়েছে। ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা(আইপিসিসি) এর এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৯ থেকে হাজার ১৯৯৮ সালের মধ্যে সুমেরু সাগরে বরফ স্তরের গলনের সময় ৫৭ দিন থেকে বেড়ে ৮১ দিন হয়েছে। ফলে এর একদিকে যেমন বরফ গলেছে, অন্যদিকে তেমনি শীতকাল কম হয়ে যাওয়ায় বরফ জমার পরিমাণ কমেছে। শুধু যে সুমেরু সাগরে বরফ স্তরের আয়তন কমছে তাই নয় এটি বেশ পাতলা হয়ে গিয়েছে। ডুবোজাহাজ থেকে নেওয়া নানান তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে সুমেরু সাগরের বরফ স্তর বেশ কয়েক ধরে তার আগের অবস্থা থেকে প্রায় ৪০**%** পাতলা হয়ে গেছে। অংকের হিসাবে এটি প্রায় এটি প্রায় দুই থেকে তিন মিটার পাতলা হয়েছে। উপরের এই ঘটনা গুলি সুমেরু জুড়ে উষ্ণতা বাড়ার স্বপক্ষে এক বড় প্রমাণ।

সূর্য–আকাশ্ মনে হচ্ছে কিছু বলবে।

আকাশ্ – আসলে খুব সোজা কথা গুলো আমরা মনে রাখি না। এই পৃথিবী কে যে বায়ুমণ্ডল ঘিরে রেখেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে তার বিস্তৃতি প্রায় দু'শো কিলোমিটার। এই বাতাস সর্বত্র সমান ভারী নয়। ভূপৃষ্ঠের বাতাস সবচেয়ে ভারী । উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় । এই তাপমাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে বায়ুমন্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে । ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার উপর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটির নাম **স্ট্রাটোস্ফিয়ার** । ওই অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের হালকা স্তর রয়েছে ।সারা পৃথিবীতে জীবজগতে বিশেষ করে মানব জীবনের উপর ওই বিশেষ গ্যাসীয় স্তরটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ।

তবে সে আলোচনার আগে ওজোন গ্যাসের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন ।ওজোন গ্যাসের অণুতে থাকে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু ।অর্থাৎ ওজন কে কতটা অক্সিজেনেরই ভারী সংস্করণ বলে ভাবা যায় ।ওজনের যে স্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ার-এ থাকে, সেই স্তরটি আমাদের অতি বেগুনি রশ্মি নামক বিশেষ ধরনের বিপদজনক বিকিরণ থেকে রক্ষা করছে ।ওজন ও প্রাণী জগতের বিকাশের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে ।পৃথিবীর শুরুতে কিন্তু এই বায়ুমণ্ডল ছিল না। ওজোন গ্যাসের স্তরও ছিল না ।ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পুরোটাই সরাসরি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ত ।বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে জৈব রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ বিক্রিয়াতে
প্রাণিজগতের জরুরী যৌগ গুলির উদ্ভব হয়। যদিও আদিম প্রাণী কেউ এই রশ্মির প্রভাব থেকে বাঁচতে স্থান নিতে হতো সমুদ্রের গভীরে। উদ্ভিদেরা বায়ুমন্ডলে আলোক রাসায়নিক সংশ্লেষে অক্সিজেন তৈরি করতে থাকে ।এই অক্সিজেনের ঊর্ধ্বাকাশে পৌঁছাত। তা ভেঙ্গে তৈরী করে ওজন । ওজোন গ্যাসের স্তর ক্রমশ সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে বাধা দেয় । ফলে প্রাণিজগতের বিকাশের ধারাটি আরো সচল হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অতি বেগুনি রশ্মি কি ?
সূর্যের সাতটা রং এর কথা আমাদের প্রায় সকলেই জানা। আমাদের চোখে বেগুনি থেকে শুরু করে লাল পর্যন্ত যে সাতটি রং ধরা দেয়, সূর্য কিরণের ভান্ডারে কিন্তু তার চেয়েও বেশি কিছু রয়েছে। যা আমাদের চোখে ধরা দেয় না। এমন একটি অংশ অতিবেগুনি রশ্মি নামে পরিচিত । এ বেগুনির থেকেও আরো বেগুনি।খালি চোখে দেখা বেগুনি রশ্মির থেকেও এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতর । তাই এই অতি বেগুনি রশ্মি অধিক শক্তিশালী ও বটে ।মানুষের শরীরে বেশি দিন ধরে বা বেশি পরিমাণে পড়লে তা চামড়ায় ক্যান্সার সৃষ্টি করে ।এছাড়া প্রাণী জগৎ ও উদ্ভিদ জগতের উপরও এই রশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন অতিবেগুনি রশ্মি আরো কিছু কিছু রোগের জন্য দায়ী হতে পারে ।
স্ট্রাটোস্ফিয়ার-এর ওজন এই রশ্মিকে শোষণ করে নিয়ে পৃথিবীতে তার পৌঁছানো বন্ধ করে জীবজগতকে রক্ষা করছে । কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলী স্ট্রাটোস্ফিয়ার-এর ওজোন স্তরের গুরুতর ক্ষতি করছে । ওজন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক রশ্মি পৃথিবীতে বেশি পরিমাণে প্রবেশ করছে ।যেমন ভাবে গায়ের জামাটাও ফুটো হলে শরীরে ঠাণ্ডা ঢোকে এবং শরীরকে অসুস্থ করে তোলে ঠিক তেমনটা ।

বৃষ্টি-কিভাবে ওজন স্তর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটাই দেখার বিসয়। সি এফ সি ও সি এম সি সাধারন ভাবে পরিচিত ক্লোরিন ও ফ্লোরিন এর কতগুলো রাসায়নিক যৌগের ওজোন স্তর নাশের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই ধরনের যৌগ রেফ্রিজারেটর ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং কোন প্লাস্টিকের বাক্স ও বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ও রং তৈরির জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে ।এই সমস্ত জায়গা থেকে বিশেষ করে স্প্রে এর মাধ্যমে যে সি এফ সি বায়ুমন্ডলে বেরিয়ে আসে , সেই সিএফসি বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে কারো সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু এই সিএফসি বায়ুমন্ডলে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ার-এ অবস্থিত ওজনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাকে ভেঙে অক্সিজেন তৈরি করে দেয় । পুরো ঘটনাটা ঘটে খুব ধীরে ধীরে। নিশ্চিত ভাবেই ওজোন স্তরের ওজনের ক্রমশ ঘাটতি দেখা দেবে। এছাড়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রীনহাউস গ্যাসের ভূমিকা পালন করবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন এর মতই গ্রীন হাউস ইফেক্ট এটা কতটা বিপজ্জনক ?অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের গাছপালা বা চারাগাছকে ঠান্ডা থেকে বাঁচিয়ে বড় করে তোলবার জন্য এক বিশেষ ধরনের কাচের ঘর ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ঘরের চারদিকে কাঁচে ঘেরা থাকে বলে সূর্যালোক সহজেই ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। তার

একটি বিশেষ ধর্ম হচ্ছে যে এর ভেতর দিয়ে সূর্যের আসা বিকিরিত রশ্মি চলে যেতে পারলেও এর জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠা মাটি থেকে অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে বিকিরন উদগত হয়, কাচ তাকে আটকাতে দেয় ।তাই কাঁচের তৈরি ঘরে, যাকে পরিভাষায় বলা হয় গ্রীন হাউস , যে পরিমাণ বিকীর্ণ তাপ প্রবেশ করে সেই পরিমাণ তাপ ভেতর থেকে বের হতে পারে না। ফলে গ্রীন হাউস এর ভেতরটা বাইরে চারপাশের চেয়ে উষ্ণ থাকে এবং ওই পরিমণ্ডলে চারাগাছকে লালন পালন করা সম্ভব হয় ।

রোদ্দুর – পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার পিছনে যা যা কারণ রয়েছে সেগুলো দূর করা কি কোন মানুষের পক্ষে একা সম্ভব?

সূর্য– দেখ **রোদ্দুর,** আমাদের মনে হতে পারে পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার পিছনে যা যা কারণ রয়েছে সেগুলো দূর করা কি কোন মানুষের পক্ষে একা সম্ভব? আমি বলব সম্ভব। কথায় বলে দশের লাঠি একের বোঝা। আমরা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে নিয়ে যদি এককভাবে এবং কখনো কখনো সংঘবদ্ধভাবে উদ্যোগ নেওয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করি , তাহলে এই গ্রীন হাউস এফেক্ট রোধ করা সহজসাধ্য হবে।

রোদ্দুর – কি করতে হবে ?

আকাশ – আমাদের বিশ্ব উষ্ণায়ন কিংবা গ্রীন হাউস এফেক্টর সমস্যাটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। দ্বিতীয়ত টিউবলাইট এর পরিবর্তে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে ফলে বিদ্যুতের চাহিদা কমবে এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন গ্যাস ইত্যাদির ব্যবহার কমবে । সৌর কুকার ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে ।আবর্জনা গোবর কিংবা মানুষের মলমূত্র থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদনের ব্যবহারের দিকে জোর দিতে হবে ।মোটর গাড়ি ইত্যাদি যানবাহনের টায়ারে হাওয়া পুরোপুরি ভর্তি দেখে , পুরনো যন্ত্রাংশ ব্যবহার না করে পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদি জ্বালানির খরচ যেমন বাঁচানো যায় , তেমন দূষণ কমানো যায় সৌরচালিত গ্যাস চালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়ানো দরকার, এসি ব্যবহার যতটা সম্ভব কমানও দরকার । যদি এসে চালানো হয় তাহলে ঘর ও দরজার ফাঁকফোকর বন্ধ করে দিয়ে বিদ্যুতের সাশ্রয় করা দরকার। পুরনো ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি যেমন ফ্রিজ ,ওয়াশিং মেশিন,ইত্যাদির বদলে- এর নতুন মডেলের জিনিস ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় । জল ব্যবহারের জন্য সরু নল ব্যবহার করলে জল এবং বিদ্যুতের দুই-ই অপচয় রোধ হয় । মোটরবাইক , স্কুটার , অটোরিকশা ইত্যাদির ব্যবহার কমিয়ে সাইকেল সাইকেল রিক্সা ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে ।এতে জীবাশ্ম জ্বালানি সাশ্রয় হবে ।মাটির গভীরে যায় এমন গাছের সংখ্যা বাড়াতে হবে। গাছ লাগানোর জন্য জায়গা না থাকলে ছাদে টবে গাছ লাগানো যেতে পারে ।প্রত্যেক বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ।

(...টিভি তে সত্যজিত রায় এর আগন্তুক সিনেমা চলছে-সান্তালি গান)

ঝর্ণা-এই এবার একটু চুপ কর।সিনেমার শেষ দৃশ্য টা দেখি।